



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 31 - 40

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

মনসামঙ্গল কাব্যে লৌকিক ধর্মাচারের অস্তিত্ব সন্ধান

ড. বুবুল শর্মা

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Email ID: bubulsarma1973@gmail.com

 0009-0003-5764-6427

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Non-Aryan beliefs,
practices,
glorification,
goddesses,
Manasa, Chand
Saudagar,
Shiva, synthesis,
cultural traditions.

Abstract

The origin of the Mangal deities can be traced to agrarian, non-Aryan beliefs and practices. In its true sense, the glorification of the Mangal gods and goddesses was not composed under any divine injunction; rather, the history of the everyday joys and sorrows of social life constitutes the principal theme of Mangal poetry.

It is noteworthy that amid the chaotic political conditions of the medieval period, conflict and contradiction were inevitable within the social and cultural spheres as well. Nevertheless, within the humanistic consciousness of certain sensitive individuals, a spirit of cultural synthesis remained alive. Consequently, even within Mangal poems devoted to the glorification of deities, a note of unity resonates through conflict and opposition. During the Turkish invasions, people from all strata of society, including the Brahmanical upper classes sought refuge far away from prosperous settlements, in underdeveloped rural areas among non-Aryan, superstition-bound communities, whose deities lacked anthropomorphic forms.

Within the Mangal poems are embedded the narratives of the joys and sufferings of common people. Although Manasa is a non-Aryan goddess, her eventual acceptance of worship by Chand Saudagar, a devotee of Shiva, signifies a phase of synthesis between folk belief and non-Aryan cultural traditions. It may therefore be said that these religiously oriented Mangal poems implicitly preserve a realistic record of the joys, sorrows, and aspirations of ordinary people.

Discussion

(১)

মধ্যযুগের ইতিহাসে বাংলা মঙ্গলকাব্য এক অমূল্য সম্পদ। ধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত এই কাব্যগুলিতে তৎকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হলেও, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ইতিকথাই বেশি মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত, তুর্কি আক্রমণের অভিঘাতে জীবনযাত্রার প্রয়োজনে উচ্চবিত্ত সমাজ মঙ্গলকাব্য রচনার অনুমতি ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিল। পরবর্তীকালে বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে লৌকিক-গ্রামীণ আচার-অনুষ্ঠান, আর্ষ দেবসমষ্টি,

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে ধীরে ধীরে এক গভীর সমন্বয় গড়ে ওঠে। বলা যেতে পারে, মঙ্গল দেবতাদের উদ্ভবের পেছনে রয়েছে আদিম মানুষের ধ্যান-ধারণা, সমাজজীবন, বিশ্বাস-সংস্কার, নানা বিশ্বয় ও ভাবনার প্রতিফলন। এই ভাবনা থেকেই বিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার। একদিকে যেমন দেহ-সাধনার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে তেমনি পার্থিব জীবনের সুরক্ষা ও সাফল্যের লক্ষ্যে অরি ও মিত্র দেবতার স্তুতিও মুখ্য হয়ে উঠেছে।

কৃষিনির্ভর অনার্য ধ্যান-ধারণা থেকেই মঙ্গল দেব-দেবীদের উৎপত্তি। প্রকৃত অর্থে মঙ্গল দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য কোনও দৈব নির্দেশে রচিত নয়; সামাজিক মানুষের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের ইতিহাসই মঙ্গলকাব্যের প্রধান উপজীব্য। প্রসঙ্গক্রমে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, -

“উপক্রমিত অসহায় কৃষিসমাজ, নিম্নবর্ণ এবং স্ত্রীমণ্ডল ভয়ে-ভক্তিতে মনসার গান গাহিয়াছে, চণ্ডীর মঙ্গল গান বাঁধিয়াছে, রঞ্জাবতী-লাউসেন-কানাড়া-কলিঙ্গার অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াছে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় রহিয়াছে একটি বিশাল গ্রামকেন্দ্রিক, জল-জঙ্গল-পরিবেষ্টিত নদীমাতৃক বাংলাদেশ, যেখানে অস্ট্রিক নরগোষ্ঠীর লোকই প্রধান-যাহারা শিক্ষায় ও সভ্যতায় পুরোপুরি আর্ঘ্য লাভ করিতে পারে নাই।”^১

লক্ষণীয়, মধ্যযুগের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতেও বিরোধ এবং সংঘাত অনিবার্য ছিল, তথাপি কিছু কিছু সংবেদনশীল ব্যক্তির মানবিক চেতনায় সাংস্কৃতিক সমন্বয় জাগ্রত থেকেছে। তাই, মঙ্গল দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য মূলক কাব্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্যেও ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তুর্কি আক্রমণে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য সমাজ আশ্রয় নিয়েছিল বর্ধিষ্ণু জনপদ থেকে বহু দূরে অনুন্নত গ্রামে অনার্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কাছে। যাদের কোন ‘Anthropomorphic’ ‘নরত্বারোপমূলক’ গঠন ছিল না। বস্তুত তুর্কি আক্রমণের ফলে সমাজের উচ্চবর্ণ থেকে নিম্ন বর্ণ পর্যন্ত সবাই বিপন্ন হয়েছিল। অনার্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদেরই বানানো অপদেবতাদের কাহিনিমূলক মেয়েলি ব্রতকথাগুলিকে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের শিষ্ট সমাজ হিন্দু পুরাণের সঙ্গে কৌশলে মিলিয়ে তৈরি করা হয় মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনি লুকিয়ে আছে। মনসা অনার্য দেবী হয়েও শেষ পর্যন্ত শিব ভক্ত চাঁদ সওদাগরের হাতে পুজো পাওয়ার মধ্যে লোকায়ত মানে অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয় পর্বই সূচিত করে। বলা যেতে পারে, ধর্মনির্ভর এই মঙ্গলকাব্য গুলিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সাধারণ জন মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনি ও আশা- আকাঙ্ক্ষার এক বাস্তব দলিল।

মনসামঙ্গলের কাহিনি সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। দেবী মনসার প্রতি ভক্তবৃন্দের ভক্তি, আস্থা ও তার মহিমার বর্ণনা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে চরিত্রগুলির আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়-এ কাব্য শুধুমাত্র দেবতার মহিমা প্রচারের জন্য রচিত নয়; বরং তৎকালীন সাধারণ মানুষের জীবনধারা, অভিজ্ঞতা এবং মানসিকতারও একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। কাব্যের মধ্যে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক, রোগ-ব্যাদি এবং বিভিন্ন বিপর্যয় মোকাবিলার পদ্ধতি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এক কথায়, মঙ্গলকাব্যে খুঁজে পাওয়া যায়, লোকসমাজের সংস্কৃতির স্বতন্ত্র রূপ ও বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, -

“মঙ্গলকাব্য বঙ্গ অঞ্চলের গ্রামীণ পরিবেশের ধর্মসাধনার আখ্যানমূলক কাব্য।”^২

মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলতে ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণ এবং বিভিন্ন অনুশাসন বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এগুলো মানুষের মানসিক গঠন ও ধর্মীয় বিশ্বাসের জগৎ তৈরি করে দেয়। সমাজ ও জীবনচক্রে জাতি-বর্ণবিন্যাস, বিশ্বাস-সংস্থা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, দেব-দেবী, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সংহত জীবনধারার ভিত্তিতেই লোকসমাজের স্থিতি গড়ে ওঠে। বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম হয় মানুষের জীবনচেতনা ও জীবিকা-নির্ভর অভিজ্ঞতা থেকেই। লৌকিক ধর্মাচার শুধু আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে না, মানব মনের ভাবনা-চিন্তাকেও পরিচালিত করে। লৌকিক ধর্মাচার মূলত সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত, যা আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় রীতি বা শাস্ত্রীয় নিয়মের বাইরে থেকেও পালনযোগ্য।

“ফ্রয়েড-পন্থী মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের আচরণ ও বিশ্বাস কেবল যুক্তি-বুদ্ধিনির্ভর নয়; বরং এগুলি বহুলাংশেই মানুষের অবচেতন স্তরের আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ আবেগ ও সংস্কারকে বহন করে চলেছে- এসবের পরিবর্তনও সময়সাপেক্ষ।”^৩

লৌকিক ধর্মাচার মূলত লোকসমাজের চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয় রীতি-নীতি, কিংবদন্তি, ঐতিহ্য, টোটাম-ট্যাবু, যাদু বিশ্বাস ইত্যাদির সমন্বিত প্রতিফলন। সেই জন্য লৌকিক ধর্মচারের ব্যাখ্যায় মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাথে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনাও একান্ত জরুরী।

“মিথগুলি কেবলমাত্র আচার সংশ্লিষ্টই নয়, যুগ যুগ ধরে এগুলি মানব সমাজের জীবনঘনিষ্ঠ প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। কারো কারো মতে অবশ্য জীবন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজন পূরণের তাগিদে নয়, ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ কল্পজগতে সৃষ্টি হয়েছে মীথ। অবশ্য এই কল্পনাও নির্দৃষ্ট আচারকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেছে।”^৪

মেয়েলি আচারের উদ্ভব ও বিকাশে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। প্রকৃত অর্থে সমাজব্যবস্থার উন্নতির ধারায় ‘কাল্টিভেশন’ থেকে ‘কালচার’-এ রূপান্তর ঘটেছে কৃষির মাধ্যমে। এই কৃষিজীবী সমাজের মানুষ সরল, অনাড়ম্বর ও অল্পে তুষ্ট দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়েছে। আবার কৃষিকাজের মধ্যেও জড়িত রয়েছে বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠান।

লৌকিক ধর্মাচার বা বিশ্বাসের মূলেই আছে কোনো কার্য বা ক্রিয়ার অনুসন্ধানমূলক কার্যকলাপ। সেই ক্রিয়া বা কার্যকলাপের কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, -

- (১) গঠনগত বৈশিষ্ট্য : সমাজব্যবস্থার শ্রেণীবিন্যাস, জীবন ও জীবিকা, এবং নানা রীতি-নীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
- (২) লোকভাবনা : যাদুবিশ্বাস, লোকবিশ্বাস ও বিভিন্ন সংস্কার।
- (৩) অনুষ্ঠান : ধর্মীয় অনুষ্ঠান, লোকাচার, ব্রত, এবং বিভিন্ন পাল-পার্বণ।

(২)

এবারে আমরা লৌকিক ধর্মচারকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি।

(১) আচার : লোকসমাজের লৌকিক ধর্মাচার সৃষ্টির কেন্দ্রে অবস্থিত লোকবিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নানা ক্রিয়ামূলক আচার-অনুষ্ঠান। ধর্মের মূল ভিত্তি হলো কোনো অনৈসর্গিক শক্তির অস্তিত্বের কল্পনা। সমাজব্যবস্থায় ধর্ম ও দেব-দেবী সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত, তার মূলে রয়েছে বিভিন্ন রীতি-নীতি। লোকাচারে ব্যবহৃত উপকরণগুলো সামাজিক এবং আচারগত প্রেক্ষাপটের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মপুরাণ’ কাব্যে আচার-অনুষ্ঠানের উপকরণ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে, কলার খুলি, আতপ চাল, তণ্ডুল, মিষ্টি, নারিকেল, তিল, তৈল, হরিতকী, আমলকি, কর্পূর, তাম্বুল ইত্যাদি।

আবার লোক সমাজে যাদু হচ্ছে, প্রকৃতির রহস্যময় শক্তি সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস। যাদুবিশ্বাস ও লোকাচার লোকসমাজে খুবই দৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত। নানা রীতি-নীতি, আচার বিশ্বাস ও নানা প্রথার সাথে যাদুর সম্পর্ক অটুট। লৌকিক ধর্মাচারের অন্তর্গত সর্বপ্রাণবাদ আকাশ, জল, মাটি, গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদির প্রতি অলৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমাজ বিজ্ঞানী ম্যারেট যাকে ‘অ্যানিমিসম বা জনসত্ত্বাবাদ’ নামে অভিহিত করেছেন। এই বিশ্বাস থেকেই লৌকিক দেবতা, যাদু বিশ্বাস এবং ধর্মাচার সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম ও লোকাচার সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, -

“বাংলাদেশের চতুর্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়িয়া আজ পর্যন্ত যে আদিম জাতিসমূহ তাহাদের আদিম জীবনধারা বহুলাংশে অক্ষুণ্ন রাখিয়া চলিয়াছে, তাহাদের পূর্বপুরুষ যে একদিন বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। - ইহাদের এক প্রধান অংশ সমতল ভূমিরই উপর রহিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের ধর্ম, আচার, জীবনাচরণ ও সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারা বিজিত জীবনকে নানাভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছে।”^৫

(২) বিশ্বাস : ধারণা - অন্ধবিশ্বাস - কুসংস্কার - সংস্কার, বিশ্বাস সর্বজনগ্রাহ্য; বিশ্বাসই মানুষের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির জন্ম দেয়। বস্তুত, এই বিশ্বাস থেকেই বিশেষ কোনো দেবতা বা দেবীর ধারণার উদ্ভব ঘটে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, -

“যে সমাজে মানুষের মানবিক চেতনার বিকাশ এখনো নিম্নস্তরে অবস্থান করছে, যেখানে যুক্তিগ্রাহ্য বিবেচনাশক্তি ক্ষীণ ও সীমিত, সেই সমাজে লোকবিশ্বাসের সঙ্গে কুসংস্কারের বাড়াবাড়িও লক্ষ্য করা যায়।”^৬

মূলত বিশ্বাসের স্বভাবই এমন যে, বিশ্বাসকে অমান্য করলে আত্মগ্লানির সম্ভাবনা বেশি থাকে। সমাজে বিশ্বাসভঙ্গের কোনো নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নেই; তাই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই মানবসমাজে নানা সংস্কারের জন্ম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ -

“ভকতি করিয়া যেনা করয়ে পূজন।
মনোভীষ্ট সিদ্ধ তার হয় ততক্ষণ।।
অপুত্রার পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
কদাচ নাহিক তার অকাল মরণ।।
স্ত্রী যার ঘরে নাই স্ত্রী আসবে ঘরে।
আশা পরিপূর্ণ হয় মনসার বরে।।”^৭

এই লাইন গুলির মধ্যে স্থানীয় বিশ্বাস, অলৌকিক আচার একত্রিত হয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যের চরিত্রসমূহ সাধারণ মানুষের মানসিকতা ও ধর্মচেতনাকে প্রতিফলিত করেছে।

“জনমে জনমে যেন ঐ পদ পাই।
ঝালুরে বর দিলা জয় বিষহরি।”^৮

লক্ষণীয়, পদ্মপুরাণের এই পংক্তিদ্বয় গভীর ভক্তিভাব ও লোকধর্মীয় চেতনার সুন্দর প্রকাশ। এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ভক্তের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট। এক জীবনে নয়, জন্মের পর জন্ম ধরে যেন দেবীর চরণসেবা ও কৃপালাভের সুযোগ মেলে। এখানে ‘পদ’ শব্দটি শুধু শারীরিক চরণ নয়, বরং দেবীর আশ্রয়, কৃপা ও মুক্তির প্রতীক। ‘ঝালুরে বর দিলা’ লোকজ ভাষায় মাতার করুণাময় রূপ ফুটে ওঠে। বিষহরি দেবী যেমন ভয়ংকর বিষের অধিদাত্রী, তেমনি তিনিই আবার বিষনাশিনী, জীবনরক্ষক। ‘বর দিলা’ কথাটি দেবীর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের ইঙ্গিত বহন করে। ‘জয় বিষহরি’ উচ্চারণে রয়েছে বিজয়ধ্বনি ও স্তোত্রধর্মী আবেগ, যা দেবীর মহিমা ও শক্তিকে স্বীকৃতি দেয়। সমগ্রভাবে এই পংক্তিদ্বয়ে পদ্মপুরাণের ভক্তিমূলক ও লোকধর্মীয় স্বরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে; যেখানে দেবী মনসা কেবল পূজিত নন, তিনি ভক্তের জীবনের আশ্রয়, ভয়নাশিনী মা এবং জন্মান্তরের মুক্তিদাত্রী শক্তি।

তাছাড়া সামাজিক নানা আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, লোককাহিনি, নৃত্য- গীত ইত্যাদি সামাজিক আচার বিধিকে জীবন্তভাবে চিত্রিত করে। লোকসমাজের প্রচলিত আনুষ্ঠানিক রীতি প্রসঙ্গে সুজিত সুর তাঁর ‘বাংলার প্রাচীনতম লোকপুরাণ : মনসামঙ্গল’ প্রবন্ধে বলেছেন, -

“লোকজীবনে প্রাচীনকাল থেকে আগত আনুষ্ঠানিক রীতিগুলি কখনোই নিরর্থক নয় সমষ্টিগত জীবনচর্চার কোন না কোন স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িত থাকবেই। পরবর্তীকাল সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েও অনেক ক্ষেত্রে মানুষ গৃহদেবতার পূজার মধ্যে অথবা অন্য কোনও অনুষ্ঠানের মধ্যেও প্রাচীন রীতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। আবার কোনও গুপ্তি নতুন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেও লোকসমাজে লক্ষ্য করা যায় -পুরাতন ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।”^৯

মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে তৎকালীন লোকজীবনের শ্রেণি বিভক্ত ধর্মাচারের একটি বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে, যার মধ্যে লোকজীবনের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষণীয়, দেবী মনসা লৌকিক দেবী, লোকসমাজেই তার অধিষ্ঠান তাই, মনসামঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে লোকাচারের ছড়াছড়ি। উদাহরণস্বরূপ - দেবী মনসার জন্ম বৃত্তান্ত, কনিষ্ঠার সাফল্য, পুনর্জন্ম, অলৌকিক গর্ভধারণ, মৃতের জীবন লাভ, সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, রূপ বদল ইত্যাদি। মঙ্গল

কবিরা রাজসভার কবি হয়েও সাধারণ মানুষের সাথে অন্তরঙ্গতা ছিল, যার ফলে উদার মনোভাব নিয়েই তারা কাব্য রচনা করেছেন।

“মনসার জন্ম বৃত্তান্ত লোককথার supernatural birth motif-এর অনুরূপ। কনিষ্ঠার সাফল্যও লোককথার একটি উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায়।”^{১০}

এই কনিষ্ঠার সাফল্য দেখানো হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যে। আবার পুনর্জন্ম লাভের যে অভিপ্রায় তাও লক্ষ্মিন্দরের পুনর্জন্ম লাভের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, মনসামঙ্গল কাব্যে নানা উপকথা, রূপকথা, ব্রতকথা, পুরা কথা, ইত্যাদি নানা লোকাচারে পরিপূর্ণ। এছাড়াও নানা অলৌকিক কর্মকাণ্ড যেমন - অলৌকিক গর্ভধারণ, মৃতের জীবন লাভ, সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, অনেক সময় রূপ বদল করা ইত্যাদি। এইসব লৌকিক উপাদানের গুরুত্বও লোকসমাজে অত্যন্ত বেশি। নানা লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, যাদুবিশ্বাস, ঝাড়-ফুক, তুক-তাক, বশীকরণ, মন্ত্র-তন্ত্র, শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয় ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যে।

“মনস্তত্ত্ববিদগণ অবশ্য সংস্কার অথবা বিশ্বাসের মূলে মানুষের গঠনকেই লক্ষ্য করেছেন। ফ্রয়েড কিংবা ইয়ুং এর মত মনস্তত্ত্ববিদগণের ধারণা সংস্কারের মূল, মানুষের অবচেতন মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত। এঁদের মতে, সংস্কার মোটেই অতীতের কোন ব্যাপার নয়, বরং সংস্কার প্রতিটি মানুষের মানসিক গঠনের সঙ্গে অনিবার্য অঙ্গ রূপে যুক্ত যা নাকি পরিস্থিতি বিশেষে আত্মপ্রকাশ করে থাকে এইমাত্র।”^{১১}

বাংলার লৌকিক ধর্মাচারের জগত বিচিত্র ও ব্যাপক। একটি সংহত জনগোষ্ঠীর বিবিধ নিয়ম-নীতি, বিধি-প্রথা, সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতি-নীতিই হল আচার। এক কথায় লোকাচার হচ্ছে গুপ্তিবদ্ধ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের রীতি-নীতি।

“লোকসমাজ যেসব আচার-আচরণে অভ্যস্ত সেগুলোই লোকাচার।”^{১২}

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট লোকাচারের সঙ্গে বিশ্বাস ও সংস্কারের একটা গভীর যোগ রয়েছে। আমরা জানি, নতুন কোন লোকবিশ্বাস বা সংস্কার হঠাৎ করে সমাজে প্রবেশ করে না। সেই বিশ্বাস বা সংস্কারের পেছনে বহু দিনের ধ্যান-ধারণা লুকিয়ে থাকে। আবার সমাজের বাইরে এবং ভেতরে নানা গোষ্ঠী, নানা কৌমের ভক্তি-বিশ্বাস ও পূজাচারের একটা যোগ বহুদিন ধরে সমাজে প্রচলিত থাকে। সময়ের সাথে সেই সুদীর্ঘ ইতিহাস কালের বিবর্তনে নতুন রূপ গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, -

“আর্য ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান, নানা দেব-দেবীর রূপ কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়া-ছুঁয়ি অনেক কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি।”^{১৩}

(৩)

লৌকিক ধর্মাচার গড়ে ওঠার পেছনে নানা মত থাকলেও সর্বপ্রাণবাদ সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। পরবর্তীতে সমাজবিজ্ঞানীরা যেসব মান্যা, ম্যাজিক, টোটাম, ট্যাবু, যাদু-বিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার মূলে এই সর্বপ্রাণবাদের ধারণাই নিহিত রয়েছে। আকাশ, মাটি, জল, হাওয়া, রোদ, বৃষ্টি, আলো, গাছপালা, পশুপাখি, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন নিসর্গ উপাদানকে কেন্দ্র করে যে অলৌকিক অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়, তাকে ‘মান্যা’ বলা হয়। লোকসমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পেছনে কোনো না কোনো অলৌকিক শক্তির ভূমিকা আছে। আর এই বিশ্বাস থেকেই সর্বপ্রাণবাদের উদ্ভব। এই ধারণাই পরবর্তীতে লৌকিক দেব-দেবী, যাদুবিশ্বাস, ধর্মাচার ও ধর্মসংস্কার ইত্যাদি চেতনার রূপ লাভ করেছে। যাদুশক্তি বা অলৌকিক শক্তির প্রতি এই বিশ্বাস থেকেই বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে।

“স্পষ্টতই প্রকৃতির উপাসনা, দেবতা কল্পনা যাদুশক্তিতে আস্থা, প্রেতের অস্তিত্বের প্রত্যয় ইত্যাদি বহুবিধ চিন্তারই মুখপাত হয়েছে ঐ মান্যার ধারণা গড়ে ওঠবার অনুষঙ্গে। সুতরাং যাদু এবং ধর্ম এই দুটি

সংস্কারেই আদি রূপ মান্যার মধ্যে নিহিত এমন কথাই মানতে হয়। অর্থাৎ মান্যা হল এই দুটি সুপ্রবল বিশ্বজনীন সংস্কারের প্রাথমিক উৎস।”^{১৪}

লোকসমাজের জীবনাচরণে আছে লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার আর নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের আনন্দে ভরপুর। আমরা জানি লোকসমাজের সংস্কার আর বিশ্বাসের জগতে আছে অতীতের টোটোম, ট্যাবু আর যাদু বিশ্বাসের নিবিড় সম্পর্ক। সংকটমুহুর্তে অমঙ্গল দূরীকরণের পদ্ধতিতে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের গভীর যোগ আছে। লোকসমাজে ঝাড়-ফুক, বশীকরণ, যাদু, মন্ত্র, নানা টোটকা, কবচ-তাবিজ-মাদুলি, ভোজবাজি ইত্যাদির মাধ্যমে নানা মুশকিল আসান ও ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা চলতেই থাকে। এই সব ক্ষেত্রে যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় তা, সম্পূর্ণরূপেই লৌকিক আচার, কোন শাস্ত্রীয় ধর্মাচার নয়। আবার কোন উপকরণ ছাড়া লৌকিক ধর্মাচার পালিত হয় না। যেমন- আম পাতা (সামাজিক অনুষ্ঠানে কিংবা পূজো উৎসবে আম পাতার ব্যবহার অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়), বেলপাতা, দুর্বা, তুলসী, মাটির ঘট, কলা, কলা পাতা, কলাগাছ (বাঙালির যেকোনো উৎসব অনুষ্ঠানে কলা, কলাপাতা, কলা গাছের প্রয়োজন পড়বেই), কদম্বগাছ, রূপসী গাছ, ধান গাছ, হলুদ, হলুদ গাছ, পান, সুপারি, তৈল, সিঁদুর ইত্যাদি। তবে সমস্ত লোকাচারে একই উপকরণ ব্যবহৃত হয় না। আচারের কামনার সঙ্গে তার উপকরণের একটা সুসম্পর্ক থাকে। তাই বলা যায়, ধর্মীয় লোকাচারে উপকরণের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য থেকে ফিরছেন, এই আনন্দে সনকা কিছু মেয়েলি আচার পালন করেছেন তা আমরা মনসামঙ্গল কাব্যে লক্ষ্য করতে পারি।

“স্নেহত দুর্বা দান্য মাতে পুরোহিতে দিল।

পুল্ল গট প্রদীপ লইয়া দুই করে

নারীগনে পুনি পুনি আগিলা চান্দরে।”^{১৫}

বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’-এ ‘অথ লক্ষীন্দর বিবাহ পালা’য় মেয়েলি আচারে ব্যবহৃত কিছু উপকরণের উল্লেখ এখানে তুলে দেওয়া হল -

“আনিয়া কলার খুলি আতপ তণ্ডুল ঢালি

পাত্র পাতিল সারি সারি।

সারি দিয়া গুয়াপান কদলী কাঁচা মর্তমান

আর দিল মিষ্ট নারিকেল।”^{১৬}

তাছাড়াও বিজয়গুপ্তের কাব্যে ‘পদ্মার বিবাহ পালায়’ তিল, তৈল, আমলকি, হরিদ্রা, পিঠালি, ‘কপূর -তাম্বুল’ ইত্যাদির প্রসঙ্গও আছে। উক্ত কাব্যের ‘বিচ্ছেদ পালাতে’ জরৎকার মুনির একটি উক্তির মধ্যে আমরা নানা উপাচারের উল্লেখ পেয়ে থাকি। ‘তিল তুলসী কুসা দেও আমার তরে’। তাছাড়াও মুনি যখন মনসাকে বলেন, -

“বাপুর প্রসাদে আমি রাজভোগে ভোগী।

বনপুষ্প দুর্বা আমি কবু নাহি তুলি।”^{১৭}

ঘটের প্রতীক হিসেবে বাঙালির মানসজগতে দেবী মনসার আরাধনা করা হয়ে থাকে। দেবী মনসা উর্বরতার প্রতীক। ‘নাগঘট’ ধান ও শস্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। আবার মনসা-পূজার সঙ্গে বৃক্ষ-পূজা ও সর্প-পূজার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যার সঙ্গে সন্তান কামনার সম্পর্কও সুস্পষ্ট। শ্রাবণ মাসে সারারাত জেগে মেয়েরা মনসার পাঁচালী পাঠের যে অনুষ্ঠান পালন করে, তার মধ্যেও প্রজনন ও কৃষি-সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান। কোনো শুভ কাজের শুরুতে মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়, যাতে অমঙ্গল দূরে থাকে। সংস্কৃতি-বিজ্ঞানে ঘটকে কখনো গর্ভবতী নারীর প্রতীক হিসেবেও কল্পনা করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই গর্ভবতী নারীর মূর্তি নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা হতো। সংস্কৃতির ইতিহাসে এসব মূর্তিকে ‘ভেনাস পুত্তলিকা’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে, এই গর্ভবতী নারী-মূর্তিগুলোর মধ্যে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে।

“এই স্তরটা পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতি বলয়েই এক সময় দেখা গেছে, বাংলার সংস্কৃতিও তার ব্যতিক্রম নয়। ঘটপূজার ‘রিচুয়াল’কে কেন্দ্র করেই মনসা কাহিনীতে নানাবিধ সামাজিক ভাবনার একটি দিক ফুটে ওঠে।”^{১৮}

লক্ষণীয়, সনকা ঘটপূজা করার মানসে সখিগণ সহ জালুয়ার পুরীতে গেছেন, -

“সুনুকা নামে পাটেশ্বরী সে সাধুর নিজ নারী
এই বার্তাআ পাইল যখন
সকীগন সঙ্গে করি আইল জালুয়ার পুরি
ঘট লইয়া করিলো গমন।”^{১৯}

লৌকিক আচারের মধ্যে আলপনা হচ্ছে আচারকেন্দ্রিক লোকশিল্প। আলপনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতীকের সৃষ্টি করা হয়, আর এই প্রতীকের মধ্যে নিহিত থাকে নানা অলৌকিক শক্তি ও যাদু বিশ্বাস।

“ব্রতের আলপনার জগত একান্তভাবেই মেয়েদেরই। কোন পুরুষের এখানে কোন অধিকার নেই। এর অংকন পদ্ধতি নিয়ে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে যতই বৈচিত্র্য থাক না কেন, একটি বিষয়বস্তু লক্ষণীয় এবং তা হল বিশেষ বিশেষ ব্রতের আলপনায় কিছু বিশেষ বিশেষ মোটিফ অঙ্কিত হয়।”^{২০}

বেহুলার সোহাগ মাগা অনুষ্ঠানে মেয়েদের আলপনা অংকনের চিত্র জানকীনাথের ‘পদ্মাপুরাণ’-এ আছে।

“জয় জুকার দিয়া নানা বাদ্দ করি:
আলিফনা করিলেক সোয়াগ বেবারি।”^{২১}

“আলপনা বা আচারমূলক চিত্র বাংলার লোক শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। স্ত্রী সমাজেই তা সর্বতোভাবে সীমাবদ্ধ।”^{২২}

আলপনার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন, -

“আলপনার মধ্যে মানুষের সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাক্রমটি নানাভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে লুকিয়ে আছে। বিচিত্র ধরনের চিহ্ন এবং প্রতীকী চিত্র মানুষ আঁকতে শিখেছে স্মরণাতীত কাল থেকেই।”^{২৩}

লোকাচার যেহেতু প্রতীক ধর্মী তাই, লোকাচারের ক্রিয়া সম্পাদনে বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে অলৌকিক শক্তি ও কামনা প্রকাশ করা হয়। আসলে লোকাচারের সঙ্গে বিশ্বাস ও সংস্কারের একটা গভীর যোগ রয়েছে। বস্তুত লোকবিশ্বাস লৌকিক আচারের অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ। আর লোকবিশ্বাসকে কার্যকর করার নামই হচ্ছে ক্রিয়া।

“বারো মাসে বারব্রতঃ
পুণ্য তিথি করে যতঃ
দেবকার্য করে অবিশ্রাম।।”^{২৪}

বেহুলা বারো মাসে বারো ব্রত পালন করেছে; পাশাপাশি তিথি পালন ও দেবকার্যও সম্পন্ন করেছে। এখানে ‘তিথি’ শব্দটি বিশেষ অর্থবাহী। আবার বেহুলার বিভিন্ন আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে ‘চান্দ্র ও সৌর’ উভয় বর্ষপঞ্জির একটি মিশ্র রূপও স্পষ্ট হয়।

কালপঞ্জি অনুসারে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস লোকজীবনে অত্যন্ত সংকটময় সময় হিসেবে বিবেচিত। এই সময়েই সর্পদেবী মনসার পূজা হয়। লক্ষ্য করা যায়, সারারাত জেগে একান্তভাবেই মেয়েরাই দেবী মনসার প্রার্থনা ও পূজা-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

“রাত্রি জাগরণ করে মেয়েরা যে অনুষ্ঠান করে থাকেন, তার সঙ্গে প্রজনন বা কৃষির সম্পর্ক থাকবেই। পূজার উপকরণ হিসেবে দুধ- কলার ব্যবহার করা হয়। যতই বলা হোক না কেন, ‘দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা’ - দুধ কলা কিন্তু সাপের আহাৰ্য নয়। এটি প্রজনন-প্রতীক।”^{২৫}

মনসা ব্রতের উদ্দেশ্যে যেহেতু নানা কামনা-বাসনের প্রসঙ্গ থাকে, তাই মেয়েরা সংসারের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং সার্বিক মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করে থাকেন। আবার মনসাব্রত পালনে কোন ক্রটি হলে কামনা বাসনার পরিবর্তে ব্রতীর অমঙ্গল হতে পারে। নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ কাব্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, -

“তুমি হেন অভাগিনী নাহি খিতি তলে।

অকালেতে রাড়ি হইল খন্ডব্রত ফলে।।

কত খন্ড ব্রত তুমি কইলা গুরুতর।

সেহি দোষে ছাড়ি তোরে জায় লখিন্দর।।”^{২৬}

জনকীনাথের পদ্মপুরাণ কাব্যেও খন্ডব্রতের প্রসঙ্গ আছে -

“নিদয়া নিষ্ঠুর বিধি বড় নিকরণ :

হাতে দিয়া কাড়ি নিল বড়ই দারুণ।

খন্ডব্রত কইলু না করিলু কিছু পুণ্য :

বিপুলা বিহনে মর সব হইল শূন্য।”^{২৭}

অর্থাৎ ব্রত ভঙ্গ করাকে পাপকার্য হিসেবে বিবেচনা করা হত। ব্রত ভঙ্গ করলে নানা অভাব-অনটন, বিপদ-আপদ ও অমঙ্গল নেমে আসতে পারে - এমন বিশ্বাস লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। লক্ষণীয় যে, ব্রতভঙ্গের ফলেই বেহুলার স্বামীর মৃত্যু ঘটে। বস্ত্ত ব্রতকথার কাহিনিগুলোর মধ্যে লোককথার নানা উপাদান মিশে থাকে। আমরা লক্ষ্য করেছি, মনসা-ব্রতে বিভিন্ন কিংবদন্তি, লোকপুরাণ ও নৈতিক বাণীর সমাবেশ এক বিশেষ মাত্রায় পৌঁছেছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলকাব্যে ষষ্ঠীব্রত প্রসঙ্গে কিছু বিধি-নিষেধ লক্ষ্য করা যায়। বাঙালি সমাজে সন্তান জন্মের ছয় দিন পরে ষষ্ঠী পূজা বা ষষ্ঠীব্রত পালনের রীতি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। এই দিনে আঁতুড়ঘরে নবজাতকের শোবার স্থানটির কাছে লেখার নানা সাজ-সরঞ্জাম রাখা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, সেই নির্দিষ্ট দিনেই চিত্রগুপ্ত নবজাতকের কপালে তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিপি লিখে দেন। এই দিনে প্রসূতি ও ধাত্রী ছাড়া অন্য কারো আঁতুড়ঘরে প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ভাই কিংবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও প্রবেশ করতে পারেন না। ষষ্ঠীপূজার এই নিষেধ ও আচার-কেন্দ্রিক ভাবনাগুলো কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

“সনকা সুন্দরী ষষ্ঠী পূজা করি

যাহার যে নীত আছে।

হাতে খড়া লইয়া রহিল জাগিয়া

মসীপত্র থুয়া কাছে।”^{২৮}

লক্ষণীয় যে, জ্যোতিষশাস্ত্র-সংক্রান্ত নানা লোকবিশ্বাস তৎকালীন সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এর ফলেই সমাজের নানা আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবে এ ধরনের লোকাচারের চর্চা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। বিজয় গুপ্তের ‘অনিরুদ্ধ উষাহরণ’-পালায় নারদের মুখে সূর্যব্রত ও একাদশী ব্রত সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসের উল্লেখ পাওয়া যায়—

“সূর্যব্রত করে যে বা পাইয়া রবিবার।

সূর্য রথে যায় সে সূর্যের যে দ্বার।।

একাদশী দিনে যে বা করে এক আহার।

বিষ্ণুর রথে যায়, সে বিষ্ণুর যে দ্বার।।”^{২৯}

বস্ত্ত, সমাজনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও আচার-অনুষ্ঠান মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিল। মনস্তত্ত্ববিদেরা অবশ্য সংস্কার বা বিশ্বাসের মূলে মানুষের অন্তর্গত মানসিক গঠনকেই প্রধান বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁদের মতে, এ ধরনের লোকাচার বা লোকসংস্কার মোটেও কেবল অতীতের বিষয় নয়; বরং মানুষের মানসিক গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ পরিস্থিতিতে আজও সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

বলা যেতে পারে, বাংলার প্রতিটি পরিবারেই কিছু না কিছু আচারগত সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। প্রতিদিনের ধর্মাচারের মধ্যে একটি করে অন্তত কোনো না কোনো সংস্কারকে কেন্দ্র করে আচার পালিত হয়। আবার এই আচার-নির্ভর নিয়মানুষ্ঠানগুলির মধ্যেই এমন কিছু উপাদান চোখে পড়ে, যেখানে আদিম মানুষের কল্পনামনের ছব্ব প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গক্রমে অলক মৈত্রের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে, -

“ধর্মীয় আচার বা রিচুয়াল আদিম মানুষ থেকে এসেছে এমনটা ধারণা করা অসঙ্গত নয়। এই রিচুয়ালের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল ঐন্দ্রজালিক সংস্কার। মানুষ যতই সভ্যতার দিকে আকর্ষণ হয়েছে ততই সে এই সংস্কার থেকে সরে এসেছে। তবু সে সমস্ত সংস্কারের মূল উৎপাতন করতে পারেনি।”^{১০}

মনসাব্রত পালনের মধ্য দিয়ে নারীর আচার-আচরণ ও নিয়ম পালনের প্রগাঢ়নিষ্ঠা ও ব্রতের উপকরণের মধ্যে আমরা সমাজ পরিবেশের এক চলমান চিত্রকে দেখতে পাই। মনসাব্রত বা সমজাতীয় ধর্মচার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে সম্ভবত গড়ে উঠেছে। লক্ষণীয়, মনসাব্রতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মাচার ও তার সঙ্গে একটি শ্রুতিনির্ভর কাহিনি মানব মনে একটা বিশ্বাসের জায়গা তৈরি করেছে।

“প্রাচীন যুগের ধর্মাচার ছিল মানুষের অর্থনৈতিক আশা- আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আরো অনেক প্রাসঙ্গিকভাবে বিজড়িত।”^{১১}

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে মনসা-পূজা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

“এইত শ্রাবণ মাস মনসা পঞ্চমী।

লুকাইয়া সনকা পূজে তথা গেলাম আমি।।”^{১২}

অর্থাৎ, শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী তিথিতে মনসা দেবীর পূজা করলে নাগভয়ের আশঙ্কা থাকে না। উল্লেখযোগ্য যে মনসা পূজার সঙ্গে নাগপূজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও নাগপূজা শাস্ত্রীয় এবং মনসা-পূজা মূলত লৌকিক।

মানুষ পার্থিব জীবনের নানাবিধ দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে,এটাই এই আচারগুলোর মূল ভিত্তি। সেই মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির স্বপ্নই মনসা-পূজার কল্পনায় স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। দেবী পদ্মার কৃপায় মানুষের সকল সংকট দূর হবে,এমন বিশ্বাস লোকসমাজে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। তাই, পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই তারা আশা করেছে যে পদ্মার প্রসাদে, -

“-হবে তার সর্বত্র কল্যাণ।।

অপত্রার পুত্র হবে, নির্ধনের ধন।

রোগীর রোগ দূর হয়, বন্দি বিমোচন।।

নারী যার ঘরে নাহি, নারী হয় ঘরে।

মনের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় মোর বরে।।”^{১৩}

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৩/৬৪
২. আলী আহসান সৈয়দ, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মধ্যযুগ*, বাতায়ন প্রকাশন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মে - ২০০৩, পৃ. ৪১৩
৩. ভট্টাচার্য মিহির (সম্পাদিত), *লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৩৩৭
৪. পোদ্দার, ড. সুস্মিতা, *লোকসংস্কৃতি : ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০০১, পৃ. ১৮৬

৫. চক্রবর্তী বরুণ কুমার, মজুমদার দিব্যজ্যোতি (সম্পাদিত), বাংলার লোকসংস্কৃতি, অপরূপ বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০১৩, পৃ. ১৮৫/১৮৬
৬. ইসলাম ডঃ মাজহারুল, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, অবসর, পৃ. ৪০১
৭. গুপ্ত বিজয়, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, পৃ. ৫১
৮. পূর্বোক্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃ. ১০৪
৯. সেনগুপ্ত পল্লব (সম্পাদিত), লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫, পৃ. ৯৭
১০. গিরি ডক্টর সত্যবতী ও মজুমদার ডক্টর সমরেশ (সম্পাদিত), প্রবন্ধ সংগ্ৰহ, রত্নাবলী, ১৯৯৯ কলকাতা-৯, পৃ. ৬৪
১১. চক্রবর্তী ডঃ বরুণ, লোকবিশ্বাস ও লোক-সংস্কার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, ২০০৩, পৃ. ২৫
১২. চক্রবর্তী বরুণ ও বন্দ্যোপাধ্যায় সুমহান (সম্পাদিত), লোকসংস্কৃতি ও নৃবিদ্যার অভিধান, অপরূপ বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা-৯, ২০০৪, পৃ. ২০৩
১৩. রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৯, ২০০০, পৃ. ২৯৫
১৪. সেনগুপ্ত পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, ২০১০, পৃ. ৫০
১৫. আচার্য ড. হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), জানকীনাথের পদ্মাপুরাণ, অক্ষর, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৯৫/২৯৬
১৬. গুপ্ত বিজয়, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, পৃ. ৩৬১
১৭. তদেব, পৃ. ২৩৩
১৮. গিরি ডক্টর সত্যবতী ও মজুমদার ডক্টর সমরেশ (সম্পাদিত), প্রবন্ধ সংগ্ৰহ, রত্নাবলী, ১৯৯৯ কলকাতা-৯, পৃ. ৭৯৪
১৯. পূর্বোক্ত, জানকীনাথের পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৯৭
২০. চট্টোপাধ্যায় সৌগত, বাংলার ব্রত ও অবনীন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৪, পৃ. ৫৯
২১. পূর্বোক্ত, জানকীনাথের পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪০৯
২২. ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লি, ২০০৫, পৃ. ১২৪
২৩. সেনগুপ্ত পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, ২০১০, পৃ. ২৮১
২৪. ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস, মনসামঙ্গল, অক্ষয় কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, নাগপঞ্চমী-১৩৮৪, পৃ. ২৪৩
২৫. সেনগুপ্ত পল্লব (সম্পাদিত), লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫, পৃ. ৯৮
২৬. দাশগুপ্ত শ্রীতমনাশ চন্দ্র সম্পাদিত, নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৭৫
২৭. আচার্য ডঃ হরেকৃষ্ণ, পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পন্ডিত জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ, অক্ষর পাবলিকেশন্স, কলকাতা ১২, ২০০৮, পৃ. ৪৪৩
২৮. পূর্বোক্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, পৃ. ২১৩
২৯. চক্রবর্তী বরুণ কুমার ও মজুমদার দিব্যজ্যোতি সম্পাদিত, বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃ. ৯৬
৩০. মৈত্র অলোক, বাংলার লৌকিক ধর্মাচারের ঐতিহ্য সন্ধান, পুস্তক বিপণি, ২০০০, পৃ. ৩৬
৩১. চৌধুরী সুজিৎ, প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার, প্যাপিরাস, ২০০০, পৃ. ৫৮
৩২. পূর্বোক্ত, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৩৪
৩৩. পোন্দার অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪, পৃ. ৮৬